পিঁপড়ে পুরান

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

পিঁপড়ে পুরাণ বইখানি দেখিয়া আর একটি ছেলেদের সুলিখিত ও সুপ্রকাশিত বইএর কথা মনে পড়িতে পারে। পিঁপড়ে পুরাণ সে বইটির অনেক পরে প্রকাশিত হইল বলিয়া ইহাতে সে বইটির ছায়া আছে একথাও মনে হওয়া অসম্ভব নয়। সেই জন্যেই একথা জানান প্রয়োজন মনে করিতেছি যে, 'পিঁপড়ে পুরাণ' উক্ত বইটির প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বেই 'রামধনু' পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। শুধু তাই নয়, উক্ত বইএর গল্পের সহিত ইহার কোন মিল নাই।

—লেখক

পিঁপড়ে পুরাণ

সে অনেক কাল আগের কথা।

তখন সবই ছিল আশ্চর্য্য রকমের। তখন ঠিক ভোরের বেলা সূর্য্য উঠ্‌ত আর এমন মজা যে, ঠিক রাত হবার আগেই সূর্য্য অস্ত যেত। দিনের বেলা তখন আলো থাকত আর রাত্তিরে হ'ত অন্ধকার।

পৃথিবীই ছিল তখন কি সুন্দর। মাটিতে নরম সবুজ ঘাস! হরেক রকম গাছে হরেক রকম রঙের ফুল আর রাত্তির বেলা আকাশে হাজার হাজার তারা—সে দেখতেই ছিল চমৎকার!

পাখীই ছিল তখন কত রকম। এক রকম পাখী ছিল, তার নাম কাক। মিস্‌কালো অন্ধকারের মত তার রঙ্। আর তার গলার স্বর! —কেউ কেউ বলে তার গলার স্বর নাকি ভাল ছিল না।

আমরা কিন্তু তা বিশ্বাস করিনা। যে কোকিল আজকাল আখছার আমাদের পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ায় তারি যদি স্বর এত ভাল হয়, না জানি কাকের স্বর কি মিষ্টি ছিল! আর এই কোকিল নাকি সেই কাকেদের বাসাতেই গলা সাধ্‌তে শিখ্‌ত। সে কাক এখন আর পাওয়া যায় না, কেউ কেউ বলে উত্তর মেরুতে পৃথিবীর যে সব চেয়ে বড় চিড়িয়াখানা আছে সেখানে নাকি একটি কাক এখনও আছে। তার জোড়াটী মরে যাওয়ায় সেটিও নাকি ভারী মনের কষ্টে আছে—বেশী দিন আর বাঁচবে না। আর এক রকম পাখী ছিল তার নাম চড়ুই। সে পাখী লোকের ঘরে দোরে কড়িকাঠের ফাটলে বাসা বাঁধতো। ক্ষুদে ক্ষুদে পাখীগুলি নাকি মানুষের বাসের কাছে নইলে থাকত না। মানুষের ফেলা ছড়ানো ক্ষুদ-কুঁড়ো খেয়েই তারা থাকত।

তোমরা ঘোড়া কেউ কেউ বোধ হয় দেখেছ। সে ঘোড়া তখন পথে ঘাটে গাড়ী টেনে লোক বয়ে

বেড়াত। কুকুর ত তখন যেখানে সেখানে ও চিতাবাঘের মত সস্তা ছিল। এখন যেমন চিতাবাঘ পোষে তখন তেমনি কুকুর পুষত এক রকম জানোয়ার ছিল—তার নাম বেড়াল বেড়ালের কথা আমরা বেশী কিছু জানি না। সেক লোকেরা বেড়াল সম্বন্ধে বেশী কিছু লিখে যায় একটি বড় পুরাণো সেকালের পুঁথিতে বেড়া বাঘের মাসী বলা হয়েছে। তাতে মনে হয় যে খুব প্রকাণ্ড জানোয়ার ছিল। কিন্তু এত জানোয়ার লোকে বাড়ীতে কি করে পুষত আমরা এখনও বুঝতে পারিনি। সরকারি পশুশালা একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বেড়াল সম্বন্ধে গবেষণ ক'রে একটি বই লিখেছেন। সেই বই প্রকাশিত হলে বেড়াল সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য কথা জানা যাবে। আরো এমন সব অদ্ভুত জানোয়ার সেকালে ছিল যা চোখে দেখলেও তোমরা বিশ্বাস করতে পারবে না—ছাগল, ভেড়া, গরু ইত্যাদি কত নাম করব।

চেয়ে মজার কথা এই যে তখনকার পিঁপড়ে
ুব বড় হলেও মানুষের কড়ে আঙ্গুলের চেয়ে
ত না। সে পিঁপড়েও ছিল নানাজাতের।
র ঘরে দোরে মাঠে গাছে নানা রকমের
ড়ে তখন গর্ত্তের ভেতর বাসা বেঁধে থাকত।
র মধ্যে দুএক জাতের পিঁপড়ে মানুষকে কামড়ে
যন্ত্রণা দেওয়া ছাড়া আর কোন ক্ষতিই করতে
ত না। দল বেঁধে একসঙ্গে তারা তখন থেকেই
ত বটে কিন্তু মানুষ তখন মোটেই ভাবতে
রেনি যে, এই পিঁপড়ের সঙ্গে পৃথিবীর অধিকার
নিয়ে তাকে একদিন লড়াই করতে হবে। অনেকে
তখন পিঁপড়ের ওপর দয়া ক'রে তাদের বস্তা বস্তা
চিনি খেতে দিত।

আর বছরে দক্ষিণ আমেরিকায় পিঁপড়েদের সঙ্গে
যুদ্ধে আমরা ভয়ানক হেরে গেছি, একথা তোম
সকলেই নিশ্চয় শুনেছ। কিন্তু তোমরা শুনে
আশ্চর্য্য হবে তখন সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকায় না

জাতের মানুষের বাস ছিল। মানুষ তখন নিজেদের মধ্যে মারামারি করতেই ব্যস্ত, পিঁপড়েরা কি করছে না করছে তা দেখবার কথা তাদের কল্পনায়ও আসেনি। খুব বেশী পিঁপড়ের উৎপাত হলে পিঁপড়ের গর্তে খানিকটা বিষাক্ত এসিড ঢেলে দিলেই ঝঞ্ঝাট চুকে যেত। ১৮৬৯ সাল পর্য্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকায় মানুষের বাস ছিল জানা গেছে। তারপর থেকেই পাশের পাহাড়ের জঙ্গল থেকে এই নূতন জাতের অদ্ভুত দক্ষ পিঁপড়ে বেরিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে মানুষ তাড়াতে সুরু করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এর আগে অনেক পর্য্যটক নানা দক্ষিণ আমেরিকার পাহাড় জঙ্গল ঘুরে বেড়িয়েছে কিন্তু কেউ এ পিঁপড়ের কোন সন্ধান পায় নাই। ১৯৫৭ সালে বিখ্যাত পর্য্যটক অশেষ রায় যখন দক্ষিণ আমেরিকার বনজঙ্গল ঘুরে এসে আন্দিজ পর্ব্বতপ্রদেশে একরকম অদ্ভুত জানোয়ারের কথা বলেন, তখন কাগজে কাগজে তাঁকে এমন উপহাস বিদ্রূপ করে যে,

শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য চুপ করে যেতে হয়। কিন্তু মৃত্যুর সময়

ছফুট লম্বা পিঁপড়ে......মানুষ তাড়াতে সুরু করে

তিনি তাঁর শেষ ডায়েরীতে লিখে যান "আমি শপথ করে বলে যাচ্ছি—আমি যে অদ্ভুত জানোয়ারের কথা

বলেছি তা মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয়।”

ওই আন্দিজ পাহাড়ের কাছেই ৬৭০৩ সালে একদল জাপানী রূপার খনি আবিষ্কার ক'রে তাতে কাজ করতে গিয়ে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তারপর ৫ বৎসর পরে তাদের তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোন পাত্তা পাওয়া যায় না। তোমরা বোধ হয় জান সে সময় এই ব্যাপার নিয়ে ভয়ানক হুলুস্থুল পড়ে যায়। অশেষ রায় যখন এই এক হাজার জাপানীর অন্তর্ধানের সঙ্গে এই অদ্ভুত জানোয়ারের কোন সংস্রব আছে বলেন তখন লোকে তাঁকে শুধু পাগলা গারদে পাঠাতে বাকী রেখেছিল। অশেষ রায় এই অদ্ভুত জানোয়ার সম্বন্ধে যে সব কথা জানান তা বিস্ময়জনক। সেকালের লোকেরা এই অপরূপ কাহিনীকে আজগুবি বলেছিল বলে তাদের বেশী দোষও আমরা দিতে পারি না।

অশেষ রায় পর্য্যটন থেকে ফিরে কোন কাগজে লিখেছিলেন—সেবার দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণে আমার

সঙ্গী ছিলেন আমার কাফ্রী বন্ধু, পৃথিবীর বিখ্যাত কীটতত্ত্ববিৎ মণ্ডুলা। আগের দিন আমরা মাসোর নদীর উৎসে পৌঁছাই। তারপর আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল আলাগাস হ্রদ।

সেদিন সন্ধ্যা বেলা আমরা ক্লান্ত হ'য়ে সারাটার কাছে একটি ছোট পাহাড়ের উপরে বিশ্রাম করছিলাম। আমাদের চারিপাশে আন্দিজের অসংখ্য শাখাপ্রশাখা তাদের বিপুল দেহ নিয়ে ঘিরে ছিল। তখনও সূর্য্য অস্ত যায় নি। আমাদের পশ্চিমে ঠিক আমাদের পাহড়ের নীচের উপত্যকার উপর তখন অস্তগামী সূর্য্যের আলো এসে পড়েছে। উপত্যকাটি আয়তনে খুব ছোট। চারিধারে পাহাড় যেন বিশাল দেয়ালের মত ওইটুকু জমিকে ঘিরে আছে,উপত্যকাটি আগাগোড়া দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আচ্ছন্ন। শুধু এক জায়গায় ছোট একটি পার্ব্বত্য জলাশয় দেখা যাচ্ছিল।

আমি তখন আমাদের ছোট্ট তাঁবুটি রাত্রের জন্য খাটাবার বন্দোবস্ত করছি। মণ্ডুলা তাঁর

সেদিনকার সংগৃহীত নূতন জাতের কীটগুলি বাক্সবন্দী করছিলেন। হঠাৎ চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে মঞ্জুলা ডাকলেন 'শুনুন'।

খুঁটি পুঁততে পুঁততে চেয়ে দেখি তিনি নিবিষ্ট ভাবে নীচের উপত্যকার দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে কিন্তু আমি কিছুই দেখতে পেলাম না।

জিজ্ঞাসা করলাম—"ব্যাপার কি ?"

মঞ্জুলা শুধু ইসারায় তাঁর কাছে যেতে বল্লেন এবং তার কাছে গেলে তিনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে নীচের পার্ব্বত্য জলাশয়টি দেখিয়ে বল্লেন—'দেখতে পাচ্ছেন ?"

জলাশয়ের ধারে কালো রঙের কি একটা জানোয়ারকে অস্পষ্ট ভাবে ঘুরতে ফিরতে দেখা যাচ্ছিল ; বল্লাম—"ও আর এমন কি ? কোন জানোয়ার টানোয়ার হবে।"

মঞ্জুলা ঈষৎ হেসে বল্লেন—"জানোয়ার টানোয়ার

হবে তা আমিও বুঝেছি কিন্তু 'কোন্' জানোয়ার ? দক্ষিণ আমেরিকায় অত বড় কালো জানোয়ারের একটা নাম করুন দেখি ! আপনি দূরবীণটা একবার বার করুন।"

সূর্য্য এরি মধ্যে পশ্চিমের পাহাড়ের আড়াল হয়ে গেছে। নীচে সমস্ত জলাশয়টির ধারে একটির পর একটি ক'রে দশটী ঐ ধরণের কালো জানোয়ার এসে তখন জড় হয়েছে।

আমার হাত থেকে দূরবীণটা একরকম কেড়ে নিয়েই মঞ্জুলা চোখে লাগালেন। কিন্তু পরের মুহূর্ত্তেই দূরবীণটা নামিয়ে বল্লেন—"যাঃ, সব মাটি হয়ে গেল।"

দুর্ভাগ্যক্রমে সেই দিনই পাহাড়ে ওঠবার সময়ে কেমন করে ঠোকা লেগে দূরবীণের কাচ দুটী ভেঙে গেছে।

সূর্য্যের আলো তখন বিরল হয়ে এসেছে। তবু সেই আলোতেই আমাদের খালি চোখে আমরা

দেখতে পাচ্ছিলাম, গভীর অরণ্যের ভেতর থেকে প্রায় দুশত ওই অপরূপ জানোয়ার জলাশয়ের ধারে এসে জড় হয়েছে। তাদের আকৃতি অদ্ভুত—সামনে ও পেছনে দুটী বড় বড় কালো ভাঁটাকে কে যেন একটি একটি খাটো কাঠিতে গেঁথে লম্বা লম্বা পায়ের ওপর সাজিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাদের আকৃতি যত না অদ্ভুত তাদের আচরণ তার চেয়ে বেশী। দলবদ্ধ হ'য়ে অনেক জানোয়ার থাকে কিন্তু এমন অপরূপ শৃঙ্খলা কোন জানোয়ারের ভেতর আছে বলে শুনিনি। তাদের এক সারে চলা ফেরা দাঁড়ানোর সঙ্গে একমাত্র খুব শিক্ষিত সৈন্যের কুচকাওয়াজের তুলনা করা যায়।

যত তাদের গতিবিধি দেখছিলাম দূরবীণের কাচ ভেঙে যাওয়ায় দুঃখ আমাদের তত বাড়ছিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে তারা শেষে একেবারে অরণ্যের সঙ্গে মিলিয়ে গেলে আমরা বিমর্ষভাবে সে দিক থেকে চোখ ফেরালাম। সে দিন রাত্রে তাঁবুতে

শুয়ে শুয়ে ঘুম আমাদের আসতে চাইছিল না। মঞ্জুলা তাঁর বিছানায় অস্থির ভাবে খানিকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করে বল্লেন—"আচ্ছা আপনার কি মনে হয় বলুন ত? এমন অপরূপ জানোয়ার এতকাল এত পর্য্যটকের কারুর চোখে পড়েনি, এটা কি বিশ্বাস করা যায়?"

আমারও সেই কথাই মনে হচ্ছিল! তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই। হঠাৎ চমকে জেগে উঠে দেখি মঞ্জুলা উত্তেজিতভাবে আমায় ঝাঁকি দিচ্ছেন। আমি চোখ খুলতেই তিনি বল্লেন 'শীগ্‌গীর বাইরে এসে দেখুন।' তখনও ঘুম কাটেনি, অর্দ্ধ-জাগ্রত অবস্থায় বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম। মঞ্জুলা তখনও উত্তেজিত হয়ে ছিলেন, বল্লেন 'চেয়ে দেখুন' 'নীচে চেয়ে দেখুন'। নীচে চেয়ে দেখে সত্যই অবাক্ হয়ে গেলুম। অন্ধকারে সেই পার্ব্বত্য জলাশয়ের ধারে নানা জায়গায় অসংখ্য আলো জ্বলছে। সে আলোয় আমাদের পাহাড় থেকে

বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছিল না, শুধু অস্পষ্ট ভাবে ওই জানোয়ারদের নড়া চড়া একটু আধটু টের পাওয়া যাচ্ছিল। আমরা কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই দিকে চেয়ে বসে রইলাম। এতবড় বিস্ময়জনক ব্যাপার বিশ্বাস করতে যেন আমাদের সাহস হচ্ছিল না।

ভোর হবার কিছু আগেই সমস্ত আলো নিবে গেল। আমরা কিন্তু সেখান থেকে উঠতে পারিনি। ভোরের আলোয় ওই জলাশয়ের দিকে চেয়ে আমাদের বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। জলাশয়ের পশ্চিম পাড়ে প্রায় দশ বিঘা জমির জঙ্গল একেবারে সাফ্ হয়ে গেছে। আগের দিন সন্ধ্যাবেলা যে প্রকাণ্ড গাছগুলি সে স্থান অন্ধকার করে দাঁড়িয়েছিল তাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই।

মঞ্জুলার উত্তেজনা তখনও শান্ত হয়নি। আমার হাতটা সজোরে নাড়া দিয়ে তিনি বল্লেন "আমার কি মনে হয় জানেন, আমরা যে অদ্ভুত জানোয়ার দেখেছি তারা কীটজাতীয় প্রাণী!" এবার কিন্তু

আমি না হেসে পারলাম না, বল্লাম, "কারণ আপনি কীট-তত্ত্ববিৎ ?" মঞ্জুলা আমার পরিহাসে কান না দিয়ে বল্লেন "হ্যাঁ ভাই! কীটজাতীয় ছাড়া পৃথিবীর কোন প্রাণীর চারটার বেশী পা দেখেছেন ?" কথাটা সত্য! আমরা যে অদ্ভুত জানোয়ার দেখেছি তাদের পা কতগুলি তা গুণতে না পারলেও চারের বেশী যে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মঞ্জুলা বলে যাচ্ছিলেন "তা ছাড়া আকৃতির কথা মনে রাখবেন।"

বল্লাম, "কিন্তু এত বড় কীট।"

মঞ্জুলা বল্লেন—'অসম্ভব ত নয়'। তারপর পূরা একটি সপ্তাহ আমরা সেই পাহাড়ে ওই অদ্ভুত প্রাণী দেখবার জন্য অপেক্ষা করি কিন্তু আর কিছু দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি।"

অশেষ রায়ের বর্ণনা এইখানে শেষ হয়েছে। তারপর এক হাজার বৎসর এ প্রাণীর কথা কিছু শুনা যায় নি। অশেষ রায়ের ও মঞ্জুলার কথায় পৃথিবী শুদ্ধ লোক হাসলেও কেউ কেউ যে এ

বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্য সেখানে যায় নি এমন নয়। কিন্তু আর কোন পর্য্যটকের চোখে কিছু পড়েনি। আমরা এখন অবশ্য বুঝতে পারি অশেষ রায় এই পিঁপড়েদেরই দেখেছিলেন। তাঁর বর্ণনার একটি বর্ণও মিথ্যে নয়। কিন্তু মানুষ বেশ নিশ্চিন্ত হয়েছিল। এই পিঁপড়ের কথা যখন আমরা জানলাম তখন আর সময় নেই। ৭৭৫৭ সালে একেবারে বজ্রাঘাতের মত আচম্বিতে মানুষকে এই পিঁপড়ের আক্রমণ অভিভূত ক'রে দেয়। আক্রমণের আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কেউ এ কথা কল্পনাও করেনি। পিঁপড়েরা যে বহুদিন থেকে গোপনে প্রস্তুত হয়েছিল তার প্রমাণ ৭০ ডিগ্রি লঙ্গিচিউডের পশ্চিম ধারে দক্ষিণ আমেরিকার সমস্ত প্রধান নগর একদিনে ধ্বসে পড়ে। কতদিন আগে হতে পিঁপড়েরা এই নগরগুলা ফোঁপরা করে এসেছে কেউ বলতে পারে না। মানুষ মাটির ওপরেই যুদ্ধ করতে ব্যস্ত। মাটির তলায় কোন শত্রু তার

সর্ব্বনাশের আয়োজন করছে এ কথা সে কেমন করে জানবে। ৭৭৫৭ সালের পয়লা ফাল্গুন রাত একটার সময় কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, পেরু, ইকোয়েডারের সমস্ত বড় বড় সহর হঠাৎ ভীষণ শব্দে ধ্বসে পড়ে, তখনও কেউ সন্দেহ করে নি—এ কোন শত্রুর কাজ। বিরাট ভূমিকম্প ভেবেই মানুষ তখন ভয় পেয়েছিল। কিন্তু ধ্বসে পড়া নগরগুলির বিরাট বিশৃঙ্খলার ওপর যখন প্রভাত হল, তখন যে দৃশ্য প্রতি নগরের মুষ্টিমেয় জীবিত নগরবাসীদের চোখে পড়ল, তা ভয়ঙ্কর। প্রতি নগরের চারিধারে অসংখ্য পিপীলিকা-বাহিনী ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

পিঁপড়েদের সে প্রথম আক্রমণে যে সমস্ত নগর ধ্বংস হয়ে যায় তার একটি মাত্র অধিবাসী রক্ষা পেয়েছিলেন। তিনি রায়োবামা নগরের ডন পেরিটো। নগর ধ্বংসের সঙ্গেই অধিকাংশ লোক মারা পড়েছিল, যে কয়জন সকাল বেলা পর্য্যন্ত কোন

রকমে জীবিত ছিল পিঁপড়েরা তাদের নির্ম্মমভাবে সংহার করে। মানুষ সেবার যুদ্ধের অবসর পর্য্যন্ত পায়নি—প্রস্তুতই তারা ছিল না। ডন পেরিটা কোন রকমে তাঁর এরোপ্লেনে চড়ে একেবারে মেকসিকোতে পালিয়ে আসেন। এরোপ্লেনে চড়েও যে নিস্তার ছিল, তা নয়। এমনি এরোপ্লেনে আরো অনেকে পালাতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পাখা-ওয়ালা পিঁপড়েরা আকাশে পর্য্যন্ত তাঁদের অনুসরণ করে তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। ডন পেরিটোর জীবন রক্ষা হয়েছিল শুধু তাঁর উপস্থিত বুদ্ধিতে! অন্য সকলের মত প্রথম থেকেই এরোপ্লেনে লম্বা পাড়ি দেবার চেষ্টা না করে তিনি প্রথম শুধু ঊর্দ্ধে আরোহণ করবার চেষ্টা করেন। পিঁপড়েরা আট হাজার ফিট্ পর্য্যন্ত তাঁকে তাড়া করে, কিন্তু আর বেশী তারা উঠ্‌তে পারে না বলেই রেহাই পান। পিঁপড়েদের প্রথম আক্রমণের কাহিনী পৃথিবীর লোক তাঁর কাছেই পায়।

তারপর কয়েক বৎসরের মধ্যে পিঁপড়েরা কি ভাবে গায়না, ব্রেজিল, বলিভিয়া, আর্জেনটাইন রিপাবলিক দখল করে তার, ইতিহাস তোমরা কিছু কিছু নিশ্চয়ই জান।

আশ্চর্য্যের কথা এই যে, পিঁপড়েদের প্রথম আক্রমণের পরেও দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দেশ তেমন ভাবে সাবধান হয়নি। তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, প্রথম আক্রমণের পর দু'বৎসর তাদের আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় নি। হঠাৎ দু'বৎসর বাদে একদিন অমনি মধ্য রাত্রে ৫২ ডিগ্রী লঙ্গিচিউডের পশ্চিমের সমস্ত সহর ধ্বসে পড়ে। এই লঙ্গিচিউড ধরে পিঁপড়েদের আক্রমণ আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার। এবারেও সেই আগেরবারের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হয়। শুধু অরিনকো নদীর ধারে বলিভার নগরের লোকেরা আগে হ'তে সন্দেহ করে সহর ছেড়ে নদীতে অস্ত্র-শস্ত্র ও যুদ্ধ-জাহাজ নিয়ে জড় হয়েছিল। তারাই কেবল যুদ্ধ করে মরবার

সৌভাগ্য পেয়েছিল। এই যুদ্ধে প্রথম পিঁপড়েদের অদ্ভুত অস্ত্রের ও তাদের যুদ্ধ-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুদ্ধের শেষে কয়েকজন মাত্র বলিভার-নগরবাসী নদী দিয়ে মটর লঞ্চে আতলান্তিক সাগরে পালিয়ে রক্ষা পেয়েছিলেন।

পিঁপড়েরা যে অস্ত্র ব্যবহার করে তাকে খুব ভয়ঙ্কর এক রকম বোমা বলা যেতে পারে। কিন্তু বোমা প্রয়োগ করার রীতিটাই সব চেয়ে অদ্ভুত। বলিভার নগরবাসীরা বলেন—"যখন তীর থেকে বহু উড়ন্ত পিঁপড়েকে গোল গোল এক রকম জিনিষ নিয়ে আমাদের দিকে উড়ে আসতে দেখি তখনই তাদের দিকে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করি। অনেক পিঁপড়ে এই ভাবে মারা পড়ে, কিন্তু দু'একটা পিঁপড়ে সমস্ত গোলাগুলি এড়িয়েও আমাদের জাহাজ নৌকাতে এসে পড়ে। তাদের পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক বোমা ফেটে জাহাজ নৌকা গুড়িয়ে ধূলো হয়ে যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে,

প্রত্যেক বোমার সঙ্গে একটি করে পিঁপড়ে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে প্রাণ দেয়। দূর হতে নিক্ষেপ করে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার কোন সম্ভাবনা তারা রাখে না।

পিঁপড়েদের দ্বিতীয় আক্রমণের পর সমস্ত পৃথিবী সচেতন হয়ে ওঠে। চীনের পিকিন্ সহরে পৃথিবীর সমস্ত দেশের প্রতিনিধিরা মিলে কর্ত্তব্য স্থির করবার চেষ্টা করেন। পৃথিবীর সমস্ত দেশ থেকে অসংখ্য যুদ্ধ-জাহাজ, অসংখ্য এরোপ্লেন, অসংখ্য সৈন্য দক্ষিণ আমেরিকার বাকী দেশগুলির অধিবাসীদের হয়ে যুদ্ধ করবার জন্য পাঠান হয়। কিন্তু যুদ্ধ করবে কার সঙ্গে? পিঁপড়েদের আস্তানার কোন পাত্তাই কেউ পায় না। মাটির তলায় কোথা দিয়ে তাদের গতিবিধি সমস্ত আমেরিকা খুঁড়ে না ফেল্‌লে জান্‌বার উপায় নেই। সৈন্যেরা দিনের পর দিন, ক্রোশের পর ক্রোশ পার হয়ে তন্ন তন্ন করে সমস্ত খুঁজে বেড়ায়। তারপর একদিন হঠাৎ এক জায়গায় গভীর রাত্রে তাদের পায়ের তলায় মাটি ধ্বসে পড়ে। সকাল বেলা তাদের

আর চিহ্ন পাওয়া যায় না। এরোপ্লেনের দল ঝাঁকে ঝাঁকে দক্ষিণ আমেরিকার আকাশে বিচরণ করে

পিপড়েদের এরোপ্লেন আক্রমণ

বেড়ায়। পিঁপড়েদের কোন পাত্তা পাওয়া যায় না

এরোপ্লেনগুলিরও কোনমতে আট হাজার ফিটের নীচে নামবার উপায় নাই, কোথা থেকে একশো এরোপ্লেনের জায়গায় হাজার হাজার উড়ন্ত পিঁপড়ে এসে আক্রমণ করে।

পিঁপড়েদের সঙ্গে এরোপ্লেন নিয়ে লড়াও শক্ত। একটাকে মারতে একশ'টা এসে ছেঁকে ধরে। সব চেয়ে মুস্কিল, তারা এরোপ্লেনের ঘূর্ণমান পাখার সঙ্গে জড়িয়ে এরোপ্লেনকে অচল করে মাটিতে ফেলে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও মরে।

আট হাজার ফিট ওপর থেকে পিঁপড়েদের কোন সন্ধানও মেলে না।

এদিকে মাটির ওপর বাকী সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকা তখন প্রাণপণে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। যেখানে যে সহর ছিল, সমস্ত সহরের লোক সহরের বাইরে নতুন করে ঘর বেঁধে বাস করতে আরম্ভ করলে। কখন যে কোন্ সহর ধ্বসে পড়ে তার ঠিক কি? পিঁপড়েরা কবে থেকে কোন্ সহরের তলা

ফোঁপরা করে রেখেছে, তা কে বলতে পারে ?

কিন্তু পিঁপড়েদের তৃতীয় ও শেষ আক্রমণ এল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে। হঠাৎ একদিন সমস্ত নতুন সহরের মাঝে সকাল থেকে মড়ক স্নুরু হয়ে গেল। সুস্থ, সবল মানুষ হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যায়, তারপর কয়েক মিনিট হাত পা খিঁচে মারা যায়! কাতারে কাতারে সকাল থেকে লোক মারা পড়তে থাকে অথচ ডাক্তার বৈজ্ঞানিকেরা রোগের স্বরূপই খুঁজে পান না। সারা পৃথিবী এ সংবাদ শুনে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। বড় বড় মাথা ঘেমে উঠ্‌ল, কিন্তু এ মড়কের কারণ বোঝা গেল না। একদিন এ ভাবে অর্দ্ধেক আমেরিকার লোক নিঃশেষ হয়ে যাবার পর, পরের দিন সকালে রোগের কারণ আবিষ্কার করলে কিন্তু বাহিয়া সহরের একজন মুটে। সকালবেলা সহরের সৈন্যাধ্যক্ষ, শাসনকর্ত্তা আর তিনজন বৈজ্ঞানিকের একটি গোপন সভা বসেছে। শাসনকর্ত্তা

নিরুপায় হয়ে সহর ছেড়ে, আমেরিকা ছেড়ে, একে-বারে জাহাজে করে এ ভয়ানক দেশ ছেড়ে যাবারই প্রস্তাব করেছেন। বৈজ্ঞানিক ও সেনাপতিদের মধ্যে এই কথা নিয়ে তর্ক বিতর্ক হচ্ছে—এমন ভাবে পিঁপড়েদের কাছে হার স্বীকার ক'রে পালিয়ে যাওয়ার চেয়ে দাঁড়িয়ে মরাও ভাল বলে সৈনাধ্যক্ষ তাঁর বক্তব্য স্থরু করেছেন, এমন সময়ে হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁদের সভার প্রহরীকে এক রকম বগল দাবাতে চেপে ধরে নিয়েই একটা বিশালকায় লোক ঘরের ভেতর এসে আছাড় খেয়ে পড়ল। সভার সকলে ত স্তম্ভিত! লোকটা যেমন লম্বা তেমনি চওড়া—মাংসের একটা পাহাড় বল্লেই হয়। কিন্তু তার সমস্ত মুখে কে যেন কালি মাখিয়ে দিয়েছে। সে মুখের দিকে চাইলেই বোঝা যায় এই অজানা ভয়ঙ্কর রোগ তাকে প্রবল ভাবেই আক্রমণ করেছে। শেষ হবার তার আর দেরী নেই। সেই বিশাল বিরাট দেহ সেই ভীষণ রোগের প্রভাবে এর মধ্যেই কাঁপতে

স্থরু করেছে। তার ভীষণ বাহুর চাপে প্রহরীটিরও তখন প্রাণান্ত হয়ে এসেছে। প্রথম বিস্ময় কেটে গেলে সেনাপতি তাড়াতাড়ি গিয়ে তার বাহুপাশ থেকে প্রহরীকে ছাড়িয়ে দিতে গেলেন। প্রহরী তখন চীৎকার করছে যন্ত্রণায়। কিন্তু সে বিশাল দেহের জোরের সঙ্গে কি পারা যায়! লোকটার তখন হাত পা খিঁচুনি স্থরু হয়েছে। অনেক কষ্টে প্রহরীকে যখন সবাই মিলে মুক্ত করলেন তখন দেখা গেল তার একটা পাঁজরা একেবারে ভেঙ্গে গেছে! প্রহরী ত অনেক কষ্টে জানালে যে, এই লোকটাকে সভায় ঢুকতে মানা করতে গিয়েই তার এই দুর্দ্দশা এবং লোকটাকে সে চেনে, সে এই সহরের একজন মুটে—তার নাম গুস্তাভ।

কেন তার সভায় ঢোকবার এত ব্যগ্রতা সে কথা তখন গুস্তাভকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। মৃত্যুর পূর্ব্ব-লক্ষণরূপ প্রবল হাত পা খিঁচুনি তখন তার স্থরু হয়েছে। কয়েক মিনিট বাদেই সব শেষ হয়ে যাবে।

সভার সকলে বিমর্ষ মুখে তারই অপেক্ষা করতে লাগলেন। দু' এক মিনিটের মধ্যেই গুস্তাভ মারা গেল, কিন্তু মারা যাবার আগে একটিবার চোখ খুলে সে উন্মত্তের মত চীৎকার ক'রে উঠেছিল—'জল খেওনা।' তারপর সব শেষ।

'জল খেওনা'! এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের সামনেও সেনাপতি হেসে ফেল্লেন। শাসনকর্ত্তা কাতর ভাবে মুখ ফেরালেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে হঠাৎ একজন যেন উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। মুখ চোখ তাঁর অসাধারণ ভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেনাপতির পিঠ হঠাৎ চাপড়ে দিয়ে তিনি বল্লেন, "আমরা কি গাধা!" সবাই ত অবাক্। শাসনকর্ত্তা বল্লেন "আপনি একটু বিশ্রাম করুন গে যান, কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত একটিবারও ত চোখের পাতা মোড়েন নি।" সবাই ভাবছিল বৈজ্ঞানিকও বোধ হয় পাগল হয়ে গেলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পাগল হয় নি। সেনাপতিকে দুহাতে ধরে তিনি বল্লেন "আপনি

কাল থেকে এখন পর্য্যন্ত কি খেয়েছেন ?”

ম্লান হেসে শাসনকর্ত্তা বল্লেন “খাবার কি সময় পেয়েছি—শুধু এক পেয়ালা দুধ।” কিন্তু এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বৈজ্ঞানিক বল্লেন “এবার বুঝেছেন ?”

এতক্ষণে সকলেই বুঝেছিলেন। নানান্ কারণে, বিশেষতঃ এই ভয়ঙ্কর মড়ক নিবারণের উপায় চিন্তায়, তাঁদের কারুরই এই একদিন জল ত দূরের কথা, কিছু খাবারই সুযোগ হয় নি।

বৈজ্ঞানিক বল্লেন “যাকে আমরা নতুন রোগ ভাব্ছিলাম তা বিষের ফল মাত্র। সহরের জল বিষাক্ত হয়ে গেছে এবং কারা বিষাক্ত করেছে তা বোধ হয় আর বলতে হবে না।”

সমস্ত সহরে অবশ্য তখনই ঢেঁড়া পিটে দেওয়া হল এবং দক্ষিণ আমেরিকার সকল স্থানে তার ক’রে একথা জানিয়ে দেওয়া হ’ল। সত্যই সহরের জল

বিষাক্ত হয়েছিল। প্রত্যেক সহরের প্রধান ট্যাঙ্কের জল কি ভাবে কখন যে পিঁপড়েরা বিষাক্ত করে দিয়েছিল তা অবশ্য কেউ জানে না।

কোন রকমে এ যাত্রা মানুষ রক্ষা পেল বটে কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার অর্দ্ধেক মানুষ কাবার হবার আগে নয়।

কিন্তু এ ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রে সহরে সহরে সাড়া পড়ে গেল—পিঁপড়েরা আক্রমণ করতে আসছে। এবার যুদ্ধ মাটির ওপরে সামনা সামনি। মানুষ এরই জন্যে এতদিন অপেক্ষা করছিল। মাটির ওপর যুদ্ধ করতেই সে অভ্যস্ত। এ যুদ্ধের জন্য সে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

পিঁপড়েদের এই তৃতীয় আক্রমণের কাহিনী রায়ো ডি জানেইরোর বিখ্যাত লেখক সেনর সাবাটিনির লেখা থেকে আমরা পেয়েছি। তাঁর বিবরণই এখানে তুলে দিলাম।

সেনর সাবাটিনি লিখেছেন—“হঠাৎ গভীর রাত্রে সহরের পশ্চিম ধারের প্রাচীরের প্রহরীরা সংবাদ দিলে দূরে লাখ লাখ পিঁপড়ে এসে জড় হয়েছে। প্রস্তুত আমরা দিন রাতই থাক্‌তাম। সুতরাং এ সংবাদে আমাদের বিচলিত হবার কিছু ছিল না। বরং এতদিন বাদে সামনা সামনি যুঝতে পাব বলে আমরা সমস্ত সৈন্যেরা উল্লসিত হয়ে উঠলাম। পশ্চিমের প্রাচীরের সমস্ত সার্চ্চলাইট তখন রাত্রিকে দিন করে তুলেছে। সেনাপতির আদেশে অন্য সমস্ত দিকে কয়েকজন প্রহরী ও সৈন্য ছাড়া আমরা সকলে পশ্চিমে নগর-প্রাকারের বাইরে এসে জড় হলাম।

সেখানে যে দৃশ্য আমরা দেখলাম তা জীবনে ভোলবার নয়। অন্ধকার রাত্রি আমাদের অসংখ্য সার্চ্চলাইটের প্রখর আলোয় তিন মাইল পর্য্যন্ত একেবারে যেন পেছিয়ে গেছে। সেই আলোয় আমাদের সহর থেকে দু মাইল দূরে অসংখ্য পিঁপড়ের

বাহিনী কালো সমুদ্রের বন্যার মত আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। পিঁপড়ের সারের পর পিঁপড়ের সার, যতদূর আলো পৌঁছোয় ততদূর পর্য্যন্ত শুধু পিঁপড়ের সমুদ্র।

সেনাপতির আদেশে আমাদের এক হাজার কামান গর্জ্জন করে উঠল। ঘন পিঁপড়ের সারের মধ্যে আমাদের কামানের গোলায় যে ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা আরম্ভ হল তা বর্ণনা করা যায় না। দিকে দিকে আমাদের গোলায় ছিন্ন ভিন্ন হয়েও কিন্তু পিঁপড়েরা থামল না। মরা পিঁপড়ের স্তূপের ওপর দিয়ে নতুন পিঁপড়ের দল তেমনি অগ্রসর হতে লাগ্‌ল।

পিঁপড়েরা আমাদের গোলার জবাব দেয় না, শুধু নিঃশব্দে অগ্রসর হয়। সেনাপতির আদেশে এবার আমরা অগ্রসর হলাম। প্রথমে বিষাক্ত গ্যাস নিয়ে একদল, তার পাছু পাছু আমাদের আটশত ট্যাঙ্ক। প্রাচীর থেকে সার্চ্চলাইট নাবিয়ে বড়

বড় গাড়ীর ওপর তুলে সেগুলিও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হল।

পিঁপড়েদের দিক থেকে তবু কোন জবাব নেই। শুধু তারা ধীরে ধীরে এগোয়। সেনাপতি আদেশ দিলেন "বিষাক্ত গ্যাস ছাড়ো।" বিষাক্ত গ্যাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু পিঁপড়েদের অগ্রসর হওয়া বন্ধ হল। সে গ্যাসে ও আমাদের ট্যাঙ্কগুলির মেশিনগানের গুলিতে লাখো লাখো পিঁপড়ে মারা গেল। যে দিকে বিষাক্ত গ্যাস ছোড়া হয় সেদিকে পিঁপড়ের সার যেন কে মুছে দেয়। শুধু মাটি কালো করে অসংখ্য পিঁপড়ের মৃতদেহ পড়ে থাকে। আমাদের ট্যাঙ্কগুলি সেই মরা পিঁপড়ের সার মাড়িয়ে অগ্রসর হয় আর তাদের মেশিনগানের গুলিতে পিঁপড়ের দল ছারখার হয়ে যায়। পিঁপড়ে-দের এই দুরবস্থায় তখন আমরা উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে উঠেছি। সহর থেকে ছেলে মেয়ে বুড়োরা পর্য্যন্ত তখন পিঁপড়েদের ধ্বংস দেখবার জন্যে প্রাচীরের

বাইরে আমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

পিঁপড়েরা হঠাৎ যখন পেছু হাঁটতে আরম্ভ করল, তখন তাদের অর্দ্ধেকের বেশী মারা পড়েছে। কিন্তু পেছুলে কি হবে? আমাদের ট্যাঙ্কগুলি তখন একেবারে তাদের ভেতরে গিয়ে পড়েছে। সেই বিশাল দেহ ট্যাঙ্কগুলির চাপেই যে কত পিঁপড়ে মারা গেল তার ঠিক নেই।

আমার তখন মনে হচ্ছিল, এতদিন আমরা মিথ্যাই ভয় পেয়েছি। হয়ত কোন উপায়ে তারা কিছু শক্তি অর্জ্জন করেছে; কিন্তু হাজার হলেও তারা কীট—সামান্য কীট মাত্র। মানুষের শক্তি, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের কৌশলের বিরুদ্ধে তারা লড়তে আসেই বা কোন্ সাহসে? তাদের এই দুর্দ্দশায় এখন কি করুণাই আমার হচ্ছিল! সেনা-পতির আদেশে তখন অশ্বারোহী সৈন্যের দল তাদের ভেতর গিয়ে পড়েছে। এ যুদ্ধটা আমার একটা বীভৎস প্রহসনের মত লাগছিল। অসহায় পিঁপড়ের

দলের ব্যর্থ পেছু হাঁটবার চেষ্টা দেখে আমার সত্যই কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে; ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পেছু হাঁটতেও তারা ছত্রভঙ্গ হয় নি।

এবার সেনাপতির আদেশে আমরা, পদাতিক দল, অগ্রসর হলাম। সেনাপতির আদেশ, একটি পিঁপড়েও যেন আজ না বাঁচে। কিন্তু খানিক দূর অগ্রসর হতে হতেই আমরা থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পিঁপড়ের বাহিনীর একেবারে পেছনে প্রায় শ পাঁচেক সার্চ্চলাইট্‌ জ্বলে উঠেছে। পিঁপড়েদেরও সার্চ্চলাইট থাকতে পারে, এবং এতক্ষণ বাদে তা জ্বালবারই বা কি প্রয়োজন, ভেবে আমরা অবাক্‌ হয়ে গেলাম। সার্চ্চলাইট তাকে ঠিক বলা চলে না। আমাদের সার্চ্চলাইটের আলোর চেয়ে সে আলো শতগুণ তীব্র ও একটু যেন সব্‌জে রঙের। সেই তীব্র আলোর সরু জিহ্বা যেন তারা আমাদের আগের সৈন্যদের মুখের ওপর দিয়ে বুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্যে আমরা সবাই

দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। আমাদের সারের পর সার সৈন্যদের মুখের ওপর দিয়ে সে আলো বুলিয়ে বুলিয়ে তারা ক্রমশঃ এগিয়ে আস্‌ছিল।

জুতোর ফিতেটা অনেকক্ষণ থেকে খুলে গিয়েছিল। এই অবসরে নীচু হয়ে বসে সেটা বেঁধে উঠেই আমি দেখি সে আলো আমাদের সার ছাড়িয়ে আমাদের অনেক পেছনের সারের মুখের ওপর দিয়ে তারা দ্রুত বুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আমার পাশের সৈনিক আমার হাতটা নাড়া দিয়ে বল্লে, "সার্চ্চলাইটগুলো নিবে গেল কেন, বলত ?"

আমি হেসে উঠ্‌লাম। "কানা হয়ে গেছ নাকি, সার্চ্চলাইট আবার কোথায় নিবল ? দিব্যি ত জ্বলছে।"

সে এবার ভীতকণ্ঠে বল্লে, "কই, আমি যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না !"

আমি তার পিঠ চাপড়ে বল্লাম, "ওই চড়া

আলোয় চোখটায় একটু ধাঁধা লেগেছে। চোখটা একটু রগড়ে নাও।”

কিন্তু আমার কথা শেষ হবার আগেই আমাদের সামনের সার থেকে একজন চীৎকার করে কেঁদে উঠ্‌ল—“আমি যে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না!”

আমার পাশের সৈনিক আমার হাতটা কাতর-ভাবে জড়িয়ে ধরে বল্লে, “তবু যে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছিনা ভাই, কি হবে?”

বিদ্যুতের মত চকিতে এ ব্যাপারের আসল অর্থ আমার মনে খেলে গেল। আমাদের সমস্ত বন্দুক, কামান স্তব্ধ হয়ে গেছে, আমাদের ট্যাঙ্কগুলি নিঃশব্দ হয়ে গেছে, শুধু চারিদিক থেকে অসহায় সৈন্যদের চীৎকার, কলরব, বিলাপ তখন তুমুল হয়ে উঠেছে।

আতঙ্কে পেছনে ফিরে চীৎকার করে উঠলাম, “চোখ বন্ধ কর, চোখ বন্ধ কর, আলোর দিকে চেয়ো না।” কিন্তু চারিদিকের ভীত, অসহায় সৈন্যদের কলরব ছাপিয়ে সে ক্ষীণ স্বর কতদূর পেঁাছোয় আর!

পিঁপড়েরা তখন আমাদের সহরের প্রাচীরের কাছে সমবেত ছেলেমেয়ে বুড়োদের মুখের ওপর দিয়ে আলো বুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বৃথা চেষ্টা!

তারপর যে ভয়ঙ্কর বীভৎস ব্যাপার আরম্ভ হ'ল, তা বর্ণনা করার শক্তি আমার নেই। সেই অন্ধ অসহায় সৈন্যদের ওপর অসংখ্য পিঁপড়ে হিংস্র যম-দূতের মত ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়ল।

চীৎকার করে বল্লাম "পালাও, পালাও"—কে পালাবে, কোথায় পালাবে? অন্ধ সৈন্যের দল অসহায় ভাবে পালাতে গিয়ে নিজেদের মধ্যেই মাথা ঠোকাঠুকি করে মরতে লাগল এবং পিঁপড়ের দল সেই বিশৃঙ্খল জটলাকে নির্ম্মমভাবে সংহার করতে সুরু করলে। এই হতভাগ্য সৈন্যদের কোন রকমে বাঁচাবার উপায় না দেখে, অবশেষে নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য ছুটতে হল। কিন্তু ছুটে পালানও সোজা নয়, পিঁপড়েরা তখন ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। একটা বিশাল কালো পিঁপড়ে আমার পিঠের জামাটা

কামড়ে ধরেছিল। হাতাহাতি পিঁপড়েদের সঙ্গে এর আগে লড়তে হয়নি। শিশুর মত, সেই বিকট কীটকে দেখে, ভয়ে চীৎকার করে উঠ্‌লাম। কিন্তু চীৎকার করবার সময় সে নয়,—পাশ থেকে আর একটা পিঁপড়ে তখন আমার পায়ে প্রচণ্ড কামড় দিয়ে চলেছে। সেটার মাথায় ছোরা বসিয়ে দিতেই চট্‌চটে একরকম রসে সমস্ত হাতটা ভিজে গেল এবং পর মুহূর্ত্তেই পেছনের পিঁপড়েটার টানে একেবারে চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। সমস্ত পিঠ্‌টা ওই রকম রসে ভিজে ওঠাতে বুঝলাম, পিছনের পিঁপড়ে-টাকে দেহের চাপে থেঁৎলেই ফেলেছি। পিঁপড়ে-দের দেহগুলো আকারে বড় হলেও অত্যন্ত হাল্‌কা ও মানুষের তুলনায় অত্যন্ত নরম, এই যা রক্ষা। তাঁড়াতাড়ি উঠে আবার ছুট দিলাম—কোন্‌ দিকে তা মনে নেই।”

—এইখানে সেনর সাবাটা নির বর্ণনা শেষ হয়েছে।

রায়ো ডি জানেইরোর সমস্ত অধিবাসীর মধ্যে

একমাত্র সেনর সাবাটিনিই রক্ষা পেয়েছিলেন। পিঁপড়েদের হাত কোন রকমে এড়িয়ে, সমুদ্রে পড়ে ছোট একটি ভেলার সাহায্যে নিকটের একটি দ্বীপে উঠে তিনি সেবার প্রাণ বাঁচান। কয়েক বছর বাদে একটি চীনে জাহাজ তাঁকে সেখান থেকে উদ্ধার করে।

রায়ো ডি জানেইরোর সঙ্গে পিঁপড়েরা সেদিন দক্ষিণ আমেরিকার বাকী সমস্ত সহরই আক্রমণ করে। সে আক্রমণে কোন সহর রক্ষা পায় নি। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সেইদিনই মানুষের পাট ওঠে। তারপর আর মানুষ সেখানে পা দিতে পারে নি। গত বৎসর সে চেষ্টা করতে গিয়ে আমরা কি ভীষণভাবে হেরে গেছি, সে খবর ত তোমরা সবাই জান।

এই হলো পিঁপড়েদের দক্ষিণআমেরিকা অধিকারের ইতিহাস। মানুষ অবশ্য নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। সামান্য কীটের হাতে এই লাঞ্ছনার শোধ নেবার জন্য

পৃথিবীর বড় বড় বৈজ্ঞানিক এখন মাথা ঘামাচ্ছেন। কিন্তু শীগ্‌গির যে আমরা দক্ষিণ আমেরিকা ফিরে পাব তারও বড় আশা নেই, কারণ কি অদ্ভুত আলোয় তারা অমন করে মানুষকে অন্ধ করে দেয়, তাই এখনও আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা বুঝ্‌তে পারেন নি।

পিঁপড়েদের আমেরিকা অধিকারের ইতিহাস পাঁচ বছর আগে সংক্ষিপ্ত ভাবে কাগজে বার হয়। তারপর সেই বিবরণ পড়ে অনেকে কৌতূহলী হয়ে আরো অনেক কথা জানতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁদের কৌতূহল চরিতার্থ করবার কোন সুবিধা হয় নি। কারণ এতদিন পিঁপড়েদের সম্বন্ধে ওর বেশী কিছু জানা ছিল না। পিঁপড়েদের সম্বন্ধে বিশদ ভাবে সন্ধান দেওয়া ত দূরের কথা, মানুষ সেবার পিঁপড়েদের আক্রমণে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে পালাবারই পথ পায়নি। পিঁপড়েরা কেমন করে এই বিপুল শক্তি অর্জ্জন করেছে, তাদের রাষ্ট্র সমাজের গঠন কেমন, তারা দক্ষিণ আমেরিকাকে কি ভাবে এখন গড়ে

তুলেছে তার কোন বিবরণ মানুষের জানবার সুযোগ হত না যদি না……

যদি না ভারতীয় জাহাজ 'যমুনা'র সমস্ত নাবিক আর যাত্রী একটি দুরন্ত ডানপিটে ছেলের দৌরাত্ম্যে অস্থির হয়ে উঠত। একটি ছেলের দৌরাত্ম্যের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার পিঁপড়েদের বিবরণ সংগ্রহের সম্বন্ধ কোথায় তা প্রথমে বোঝা একটু কঠিন বটে। ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করেই বলি। ভারতীয় নৌবহরের 'যমুনা' জাহাজটি সেবার ফিলিপাইনের পূর্ব্ব উপকূল হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের একটি ছোট দ্বীপের দিকে যাচ্ছিল। দ্বীপটি দক্ষিণ আমেরিকার কাছাকাছি ও পিঁপড়েদের সঙ্গে যুদ্ধের আয়োজনের প্রধান ঘাঁটি। মাঝ রাস্তায় ঝড় হয়ে আগের দিন জাহাজ নির্দ্দিষ্ট পথ থেকে একটু দূরে এসে পড়েছিল, এখন আবার নির্দ্দিষ্ট পথ খুঁজে নেবার চেষ্টা হচ্ছিল। কিন্তু এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল শুধু একটি ছেলের দৌরাত্ম্যে। ছেলেটি যমুনার ক্যাপ্‌টেনের, বয়স

তার মাত্র বার কিন্তু দুষ্ট বুদ্ধি ও সাহসে সে পঁচিশ বছরের যুবককেও হার মানায়। ঝড়ের রাত্রে সবাই জাহাজ ও নিজেদের সামলাতে ব্যস্ত এমন সময় দেখা গেল ছেলেটি জাহাজের দুটি মাত্র লাইফবোটের একটি খুলে ঝড়ের সমুদ্রে নামিয়ে দিয়ে বসে আছে। ঝড় থেমে যাবার পর হঠাৎ ছেলেটির খোঁজ পাওয়া যায় না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল সব চেয়ে বড় মাস্তুলের আগায় উঠে সে বসে আছে। নামিয়ে এনে ধমক দেওয়ায় সে বল্লে—আমি নতুন দেশ আবিষ্কার করছিলাম।

ঝড়ের পরের দিন রাত্রে হঠাৎ মাঝ সমুদ্রে বারবার জাহাজ থেকে সার্চ্চলাইট জ্বলতে দেখে দু একজন যাত্রী এসে ক্যাপ্টেনকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে। ক্যাপটেন ত অবাক! মাঝ সমুদ্রে যেখানে অন্য কোন জাহাজের নামগন্ধ নেই সেখানে সার্চ্চলাইট জ্বালবার মানে কি? কোন্ নাবিক এ রকম করছে তার সন্ধান নিয়ে তাকে শাসন করবার

জন্যে সার্চ্চলাইট টাওয়ারে গিয়ে ক্যাপ্‌টেন দেখেন তাঁর ছেলেটি পরমানন্দে সার্চ্চলাইট জ্বালিয়ে সমুদ্রের এধার থেকে ওধার বুলিয়ে বেড়াচ্ছে। তিনি কান ধরে তাকে শাসন করতে যাবেন এমন সময়ে চকিত সার্চ্চলাইটের আলোকে একটি জিনিষ চোখে পড়ায় তিনি ছেলের শাসন করার কথা ভুলে নিজেই সার্চ্চলাইট ধরে বসলেন এবং সমুদ্রের একদিকে সার্চ্চলাইটের আলো সন্নিবেশ করলেন। সে আলোয় যা দেখা গেল তাতে বিস্মিত হওয়া স্বাভাবিক। দেখা গেল জাহাজ থেকে শ দুয়েক গজ দূরে একটি ছোট ভেলা সমুদ্রের ওপর দুলছে, তার ওপর আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা একটি অর্দ্ধ উলঙ্গ মানুষের দেহ। মানুষটি বেঁচে আছে কি না বোঝা যায় না।

তৎক্ষণাৎ তিনি নৌকো নামিয়ে ভেলাটি ধরে আনবার আদেশ অবশ্য দিলেন। এবং সেই ভেলাতে দক্ষিণ আমেরিকার পিঁপড়েদের ইতিহাস যে একটি, মাত্র লোকের জানা ছিল তার উদ্ধার হল।

তিনি সুখময় সরকার। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে মানুষ পালিয়ে আসার পর পাঁচ বছর তিনি সে দেশে কাটিয়েছেন পিঁপড়েদের সঙ্গে। এবং মানুষের ভেতর একা তিনিই তাদের সমস্ত ব্যাপার জেনে জীবিত অবস্থায় মানুষের দেশে আবার ফিরতে পেরেছেন। তাঁর পিঁপড়েদের সঙ্গে বাসের কাহিনী তিনি নিজে মুখে যা বলেছেন তাই আমরা এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম। রায়ো ডি জানেইরোর পতনের দিন তিনি নগরের ভেতর একটি লাবরেটরিতে গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় অযুত মানুষের আর্ত্তনাদ তার কানে এসে পৌঁছায়। এই খান থেকেই তাঁর বর্ণনা আরম্ভ হয়েছে—

"প্রথমে মনে হল আমাদের সৈন্যেরা বুঝি যুদ্ধ জয় করেছে তাই এই জয়ধ্বনি। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই বুঝতে পারলাম—না, এ ত আনন্দধ্বনি নয়, এ যেন সহস্র কণ্ঠের আর্ত্তনাদের মত শোনাচ্ছে। এ শব্দ শুনলে গায়ের ভেতর কাঁটা দিয়ে ওঠে।

তাড়াতাড়ি কি ব্যাপার দেখবার জন্যে নগর প্রাচীরের কাছে গেলাম। কিন্তু ওপরে উঠতে আর হল না। দূরে তোরণের ভেতর দিয়ে দেখি অন্ধের মত হাতড়াতে হাতড়াতে কয়েকজন সৈন্য এগিয়ে আসছে। তাদের এগুবার ভঙ্গি দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু বিস্ময়ের সময় বেশী ছিল না। তাদের পেছনে পেছনেই দেখি অগুণতি কালো পিঁপড়ের দল তাড়া করে আসছে। অসহায় সৈন্যদের পিঁপড়েদের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার কোন ক্ষমতা নেই। তারা এলো পাথাড়ি ভাবে হাত পা ছুড়ছে কিন্তু পিঁপড়েরা অনায়াসে তাদের পৃষ্ঠ এড়িয়ে তাদের একেবারে মর্ম্মস্থলে ঘা দিচ্ছে।

নগর-তোরণ পার হয়ে যে কয়জন এসেছিল, তাদের কেউই শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা পেলে না, একজন মাত্র সৈন্য প্রাণপণ বেগে ছুটে পিঁপড়েদের পেছনে ফেলে আমার কাছ পর্য্যন্ত এসে পড়েছিল। পিঁপড়েরা তখন আমাদের ধরে ধরে। পিঁপড়েদের

হাতে প্রাণ দেওয়া ছাড়া আর কোন গতি নাই, বুঝতে পারছিলাম।

সেই জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, এমন সময় মনে হল বৈজ্ঞানিকের মৃত্যু এভাবে হওয়া উচিত নয়। মরতে যদি হয়ত নিজের পরীক্ষাগারের ভিতর নিজের গবেষণা করতে করতেই মরব। তা ছাড়া যে পরীক্ষাটি অসমাপ্ত রেখে এসেছি পরীক্ষাগারের সকল দরজা জানালা বন্ধ করে পিঁপড়েদের গতিরোধ করলে তা সমাপ্ত করবার সময়ও হয়ত পেতে পারি।

তাড়াতাড়ি সেই দিকে ছুটছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল এই সৈন্য বেচারীকেও ত আমার সঙ্গে নিতে পারি। পেছন ফিরে বল্লাম—"আমার পেছু পেছু এস খানিকটা, নিরাপদ হতে পারবে। "কিন্তু সে আমার গলার আওয়াজ শুনে ভড়কে যে ভাবে চারদিকে তাকাতে লাগল তাতে মনে হল আমি যেন অদৃশ্য কোন একটা পদার্থ। বল্লাম, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কি ? এস আমার সঙ্গে—"

"কিন্তু আমি যে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না।"

এ কথার অর্থ কিছুই বুঝতে পারলাম না। কিন্তু তখন সে কথা আলোচনা করবার সময় নাই। তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে ছুটতে ছুটতে যখন পরীক্ষাগারে এসে পড়লাম তখন দুটো পিঁপড়ে আমাদের পেছু পেছু এসে প্রায় ধরে ফেলেছে। সৈন্যটিকে ঘরের ভেতর ঠেলে দিয়ে নিজে ঢুকে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু তারি ভেতর একটা পিঁপড়ে ইতিমধ্যে আধখানা শরীর ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলেছিল। দরজার চাপে তার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে আমার ঘরের মধ্যে পড়ল।

দরজাটা দিয়ে মনে হল, যাই হোক—এখন কিছুক্ষণের জন্যে নিরাপদ হওয়া যাবে। পরীক্ষাগারের সমস্ত জানলা আগে থাকতেই বন্ধ ছিল। পিঁপড়েরা ভেঙ্গে না ঢোকা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত ভাবে কাজ করা যাবে।

এইবার আমার সঙ্গে যে সৈন্যটি এসেছিল তার

দিকে ফিরে বল্লাম—মাটির ওপর যুদ্ধ, তাতেও পিঁপড়েদের কাছে পারা গেল না—কি তাদের এমন ভয়ানক অস্ত্র-শস্ত্র !”

লোকটা মেজের ওপর মাথা নীচু করে বসে ছিল। আমার দিকে চোখ তুলে চাইতেই ঘরের আলোয় তার চোখের দিকে চেয়ে শিউরে উঠ্‌লাম —চোখের তারার জায়গায় তার রগরগে একটা ক্ষত।

তারপর তিন দিন পরীক্ষাগারের ভেতর বন্দী হয়ে আছি। সৈন্যটির কাছে যুদ্ধে আমাদের বাহিনীর যে দুর্দ্দশার কাহিনী শুনলাম তারপর আর কোন কাজ করতে ইচ্ছা হয় নি। শুধু শান্তভাবে মানুষের নূতন জেতাদের হাতে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি। এখনও কেন যে পিঁপড়েরা আমাদের ধরবার চেষ্টা করে নি তা বুঝতে পারছি না। আমাদের দরজায় ত সারাক্ষণই প্রহরীর মত একটি পিঁপড়ে মোতায়েন আছে দেখতে পাচ্ছি, চাবির ফুটোর

ভেতর দিয়ে। জানলাগুলো দিয়েও সারাক্ষণই একটা না একটা পিঁপড়ে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা এখনও অক্ষত দেহে বেঁচে আছি। যারা অজ্ঞাত আলো দিয়ে মানুষকে অন্ধ করবার বিদ্যা আয়ত্ত করেছে তারা একটা সামান্য দরজা ভেঙ্গে ঢুকতে পারে না, এমন কথা অবশ্য মনেও স্থান দিই নি। তবু এদের মতলব কি বুঝে উঠতে পারছি না।

চতুর্থ দিন কিন্তু সব দুর্ভাবনার শেষ হল। পরীক্ষাগারের ভেতর যা সামান্য খাবার-দাবার ছিল তা একদিনে আমরা নিঃশেষ করে ফেলেছি। সকাল থেকে বুঝতে পারছিলাম পিঁপড়েরা না মারলেও উপবাসে কয়েক দিনের ভেতরই আমাদের মরতে হবে। পিঁপড়েদেরও সেই মতলব আছে কিনা বলতে পারি না। এমন করে নিশ্চেষ্ট ভাবে মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা করাও অসহ্য। ভাবলাম, বৈজ্ঞানিকের মৃত্যু তার যন্ত্র হাতেই হোক। যে সাধনা আজীবন

করে এসেছি মরবার সময় যেন তারই মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকতে পারি ভেবে যন্ত্রপাতি নিয়ে নিজের গবেষণায় মন দিয়েছি এমন সময় দেখি বন্ধ দরজার কঠিন লোহার মত কাঠ কি অস্ত্রে একেবারে মাখনের মত কেটে যাচ্ছে। চারিধার কাটা হবার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা সশব্দে ভেতরে পড়ে গেল। অন্ধ সৈনিকটি সে শব্দে চমকে ভীত হয়ে একধারে সঙ্কুচিত হয়ে গিয়ে লুকোল। আমি ভয়ঙ্কর মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালাম।

এক এক করে প্রায় ছ'টি বৃহদাকার পিঁপড়ে আমাদের ঘরে ঢুকল। তাদের এত কাছ থেকে নজর করবার কোন সুবিধা এতদিন হয়নি। লক্ষ্য করলাম, একজনের ছাড়া তাদের বাকী সকলের আকৃতি এক। একজনের মাথার আকার একটু বৃহত্তর ও মুখের শুঁড়গুলি রঙ্গে পৃথক দেখলাম। কোন প্রকার শব্দ বা সঙ্কেত শুনতে বা দেখতে না পেলেও বুঝতে পারলাম তারই আদেশে কাজ হচ্ছে।

পিঁপড়েদের সর্দার ধীরে ধীরে আমার কাছে এগিয়ে এল এবং আমার কাছে এসে হঠাৎ পেছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে আমার টেবিলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আমার পরীক্ষার যন্ত্রপাতির ওপর ঝুঁকে পড়ে কি দেখলে ও কি বুঝলে সেই জানে। আমার পাশেই সেই কদাকার লোমশদেহ কীটকে দেখে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে, এরাই মানুষের মত প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করে মানুষের সঙ্গে বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় নেমেছে। ইচ্ছে হচ্ছিল, এক চাপড়ে এই ঘৃণ্য অতিকায় কীটের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিই। সে ইচ্ছা দমন করেই অবশ্য রেখেছিলাম কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আর থাকতে পারলাম না। এই অতিকায় পিঁপড়েদের গা থেকে একটা উৎকট দুর্গন্ধ বার হয়, সে দুর্গন্ধ সহ্য করা কঠিন। পিঁপড়েটা আমার অতি নিকটে ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল, দুর্গন্ধ সহ্য করতে না পেরে তাকে ঠেলে দিলাম। ঠেলা বিশেষ জোরে যে হয়েছিল তা' নয় কিন্তু সেই

আমায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এতক্ষণ সেদিকে লক্ষ্য পড়েনি, তার কারণও ছিল—সে বিষবাষ্প বাতাসের মতই বর্ণগন্ধহীন।

জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, আমি যেন কোন্ অতলে নেমে চলেছি। চারিদিকে অন্ধকার—গাঢ় অন্ধকার! প্রথমে মনে হল, এই কি মৃত্যুর পরের অবস্থা! পরের মুহূর্ত্তেই একটি উৎকট দুর্গন্ধ নাকে যাওয়ায় সে ভয় দূর হয়ে গেল। উৎকট দুর্গন্ধও যে মানুষের মনে আনন্দ দিতে পারে আগে কখন ভাবিনি। এখন এই দুর্গন্ধ থেকে বুঝলাম আমি বেঁচেই আছি—যদিও পিঁপড়েদের বন্দী। হাত বাড়িয়ে একটি পিঁপড়ের ঠাণ্ডা গা স্পর্শ পর্য্যন্ত করলাম! অনেকদূর এই অন্ধকার দিয়ে নেমে গিয়ে হঠাৎ আলো চোখে পড়ল। অনেকটা আমাদের ইলেকট্রিক আলোর মত। কিন্তু আলো-গুলির চারিধারে কোন কাচের আবরণ নেই, বৈদ্যু-তিক শক্তিতেও তা জ্বলেনা। পাথরের মত এক

একটি নুড়ি নানা জায়গায় ছড়ান, তা থেকেই এই আলো বার হয়। পরে জেনেছি এই আলো-বিজ্ঞানে পিঁপড়েরা মানুষকে অনেক ছাড়িয়ে গেছে। তাপহীন যে আলো আবিষ্কার করবার চেষ্টায় মানুষের বিজ্ঞান এখনও অক্ষম, পিঁপড়েরা তাই বার করেছে। সেই আলোর ওপর দিকে একটি অন্ধকার সুড়ঙ্গ চোখে পড়ল, তার মাঝ দিয়ে তামার একটি নল নেমে এসেছে, সেই নল বেয়েই আমাদের লিফ্‌টের মত ঘরটি নেমে এসেছে। বুঝলাম, পৃথিবীর ওপরের স্তর থেকে নেমে একরকম পিঁপড়েদের পাতালেই নেমে এসেছি। বড় বড় খনিতে যেমন দেখা যায় এখানেও তেমনি—চারধারে বড় বড় সুড়ঙ্গ চলে গেছে। সেই সুড়ঙ্গের পথ দিয়ে অসংখ্য পিঁপড়ে যাতায়াত করছে। সমস্ত সুড়ঙ্গ পথ আলোকিত। সে আলো এত উজ্জ্বল যে, দিন বলে ভ্রম হয়।

আমার জ্ঞান হলেও হাত পা তখন অবশ।

আমাকে ঠেলা গাড়ির মত একটা গাড়িতে পিঁপড়েরা চাপিয়ে দিলে। ভাবলাম, তারা বুঝি ঠেলেই কোথাও নিয়ে যাবে। কিন্তু ছেড়ে দেওয়া মাত্র গাড়িটি আপনা থেকে চলতে আরম্ভ করলে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গাড়িটিতে না আছে বাষ্পের ইঞ্জিন, না আছে মোটর। প্রথমে এই গাড়ি পিঁপড়েদের বিজ্ঞানের আর এক কীর্ত্তি মনে হয়েছিল। কিন্তু পরে এ গাড়ির রহস্য জানতে পেরে না হেসে থাকতে পারিনি। গাড়িটি আমাদের ঘোড়ার গাড়ির জাত ভাই, শুধু ঘোড়ার বদলে এ গাড়ি যারা টানে তাদের নাম শুনলে বিস্মিত হবে। এ গাড়ির বাহন গনেশের বাহনের মত বড় বড় মেঠো ইঁদুর। অতিকায় পিঁপড়েরা এই একটি মাত্র জানোয়ারকে বশ করেছে ও কাজে লাগিয়েছে। মাটির তলায় আর কোন্ জানোয়ারই বা তাদের কাজে লাগ্‌তে পারে। এই ইঁদুরগুলিকে কিন্তু কি আশ্চর্য্য রকম শিক্ষিত তারা করেছে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয়না। মানুষ

অনেক জানোয়ার বশ করেছে কিন্তু পিঁপড়েদের ইঁদুর বাহনেরা যে ভাবে যে রকম বুদ্ধি খাটিয়ে মনিবদের কাজ করে মানুষের বশ-করা কোনো জানোয়ারকে তা করতে দেখি নি। এই ইঁদুর দিয়েই পিঁপড়েরা তাদের ছোট খাট সমস্ত কাজ করায়। পিঁপড়েদের গাড়ির তলায় প্রায় গুটি বিশেক ইঁদুর জোতা থাকে। ওপর থেকে তাদের দেখা যায় না। আদেশ পাবা-মাত্র তারা শিক্ষিত ঘোড়ার মত গাড়িটি টেনে নিয়ে যায় এবং গাড়ির বেগও বড় কম হয় না। মজার কথা এই যে, এই মুষিকদের কোন চালকের প্রয়োজন নেই, তারা নিজেরাই যেন জানে কোথায় থামতে হবে। অন্ততঃ আমার বেলা তাই হ'ল। এক জায়গায় গিয়ে গাড়ি থেমে গেল। সেখানে পিঁপড়েরা যে, ভাবে নামিয়ে আমায় নিয়ে গেল তাতে বুঝলাম তারা আমার আসার কথা আগে থাকতে জেনে প্রস্তুত হয়ে ছিল। আমাকে তারা যেখানে নিয়ে গেল সেটি একটি প্রকাণ্ড হল ঘরের মতন জায়গা। সুড়ঙ্গটি

এখানে চওড়া হয়ে এই আকার নিয়েছে। পিঁপড়েদের নিজস্ব ঘর বলে কিছু নেই তারা অনেকে মিলে এমনি এক একটি হল ঘরে দরকার হলে এসে বিশ্রাম করে ও আহারাদি করে। আমাকে হল ঘরের একটি কোণে এনে তারা শুইয়ে দিলে। তখন আমার ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্তিতে শরীরের এমন অবস্থা যে একটু গড়াতে পারলেই বাঁচি। আমি সেখানে কাত হয়ে পড়লাম। কদিন ধরে অজ্ঞান ছিলাম জানিনা। অত্যন্ত ক্ষুধা ও তৃষ্ণা পেয়েছিল কিন্তু সেকথা জানাবই বা কাকে এবং জানালেই বা কি হবে! আমার বন্দী জীবন সেই দিন আরম্ভ হল।

কিন্তু আমি না জানালেও পিঁপড়েরা মানুষের ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা ভোলেনি দেখা গেল। পিঁপড়েদের ইঁদুর ভৃত্যের কথা তখনও জানিনা। হঠাৎ বড় বড় গুটি চার পাঁচ ইঁদুরকে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে আমি আঁৎকে উঠলাম। ইঁদুরগুলি কোনরকমে বিচলিত না হয়ে কিন্তু আমার সামনে

এসে দাঁড়াল। তাদের প্রত্যেকের মুখে একটি করে জিনিষ। সেগুলি নাবিয়ে রেখে তারা আবার চলে গেল। সে জিনিষগুলি যে আহার্য্য প্রথমে বুঝতে পারিনি, কৌতূহল ভরে সেগুলি নেড়ে চেড়ে দেখতে দেখতে একটি জিনিষ যেন মূলোর মত মনে হল। ক্ষুধায় তখন আর ভাববার অবসর ছিল না। অন্য জিনিষগুলি বাদ দিয়ে সেই মূলোর মত জিনিষটিতে এক কামড় দিলাম। জিনিষটা কোন গাছের মূলই বটে কিন্তু স্বাদ তার মূলোর মত নয়। স্বাদ যে বিশেষ ভালো তাও বলতে পারিনা, কিন্তু সেদিন তাই অমৃতের মত লেগেছিল। জিনিষটি রসাল, ক্ষুধা তৃষ্ণা দুই তার দ্বারা কতকটা নিবৃত্ত হ'ল। খাবার পর ক্লান্তিতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম, বলতে পারি না।

তার পর পিঁপড়েদের সঙ্গে যে পাঁচ বছর কাটিয়েছি তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য একথা জানি যে, বিশদভাবে জানালে সে দীর্ঘ বিবরণও একঘেয়ে লাগবেনা। কারণ, প্রত্যেক

দিনই ঐ অদ্ভুত জাতের নতুন নতুন ব্যাপার আমি জানতে পেরেছি। মানুষের জ্ঞানের দিক থেকে তার প্রত্যেকটিই চমকপ্রদ! আপাততঃ সংক্ষেপে পিঁপড়েদের সমাজগঠন ইত্যাদি জানাবার চেষ্টা করব। কেমন করে পিঁপড়েরা ধীরে ধীরে আমায় একটু একটু স্বাধীনতা দিতে সুরু করলে, কেমন করে পিঁপড়েদের নানা ব্যাপার জানবার সুযোগ আমার হ'ল, কেমন করে শেষ পর্য্যন্ত আমার সেখানে একরকম প্রভাব প্রতিপত্তি পর্য্যন্ত হল, তার বিশদ বর্ণনা আমি করব না, শুধু পিঁপড়েদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে প্রথম যা প্রয়োজন—অর্থাৎ তাদের ভাষা শিক্ষা—আমার হল তাই একটু জানাব।

পিঁপড়েরা আমায় তখন স্বাধীনতা দিয়েছে, আমি যেখানে সেখানে বেড়িয়ে বেড়াই, সময় মত আহার পাই ও নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোই। চোখ দিয়ে দেখে যেটুকু বোঝবার তার বেশী কিন্তু কিছুই বুঝতে পারি না। পিঁপড়েদের কোন দিন শব্দ করতে শুনিনি।

তারা কি করে নিজেদের মধ্যে আলাপ করে, কি করে কাজ চালায় ভেবে আমার বিস্ময় লাগে। এমন সময় একদিন কয়েকটি পিঁপড়ে আমার ঘুম ভাঙ্গার পর আমার বিশ্রাম স্থানে এসে হাজির হল। তাদের ভেতর একটি পিঁপড়ের মাথাটি অত্যন্ত বৃহৎ, দেখে বুঝলাম সে সর্দ্দার টর্দ্দার হবে। বিস্তীর্ণ সুড়ঙ্গঘরের নানা জায়গায় তখন অন্যান্য পিঁপড়েদের কেউ ঘুমোচ্ছে, কেউ সবে জেগে উঠেছে। বড় মাথাওয়ালা পিঁপড়েটা আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কি দেখলে সেই জানে। দেখলাম তার মুখটা নড়ছে কিন্তু কোন শব্দ সেখান থেকে শুনতে পেলাম না। অনেকক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়ে সে কি আদেশ করলে জানি না, কিন্তু একটি পিঁপড়ে একটি ছোট গ্রামোফোনের সাউণ্ড বক্সের মত যন্ত্র নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এল। সামনের দুপা দিয়ে সেই যন্ত্রটি সে হঠাৎ আমার কাণে লাগিয়ে দিলে। আমি প্রথমতঃ প্রতিবাদ করে

যন্ত্রটি ফেলে দিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু পরে অনিষ্ট করবার উদ্দেশ্যে এত দিন বাদে তারা নিশ্চয় আসেনি জেনে চুপ করে সব সহ্য করলাম। যন্ত্রটা পরাবার সময় কাণে প্রথমটা একটু লাগল কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল চারিধারে অদ্ভুত কোন শব্দ শুনছি। প্রথমটা বুঝতে পারলাম না কিন্তু পরক্ষণেই সামনের দিকে চেয়ে বড়মাথাওয়ালা পিঁপড়েকে মুখ নাড়তে দেখে সমস্ত রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। এতক্ষণে হঠাৎ তার মুখ থেকে শব্দ শুন্‌তে পেলাম। তার মানে বুঝতে অবশ্য পারলাম না, কিন্তু এতদিনে পিঁপড়েদের কথা শুনতে পাবার আনন্দে অধীর হয়ে উঠলাম। মনের আনন্দে নিজেই 'সাবাস ভাই' বলে ফেলেছিলাম। দেখলাম আমি কথা বলা মাত্র পিঁপড়েটা অমনি একপ্রকার যন্ত্র তার নিজের কাণে লাগাল। বুঝলাম আমাদের শব্দও সে এইভাবে শোনবার চেষ্টা করছে। পিঁপড়েটা তারপর বহুক্ষণ কথা কইল কিন্তু তার শব্দ শুনতে পেলেও অর্থ

বুঝতে না পেরে মনে হচ্ছিল এমনভাবে শব্দ শুনতে পেয়েই বা লাভ কি ? কিছুক্ষণ বাদে পিঁপড়েটি নিজে থেকেই তাদের ভাষা আমার শিক্ষা দেবার উপায় করে নিলে রাত্রের আহার্য্যের কিছু তখনও আমার শয্যা-পার্শ্বে পড়েছিল সেইদিকে একটা পা বাড়িয়ে সে একটা শব্দ করলে, আমিও সঙ্গে সঙ্গে বল্লাম 'খাবার'; পিঁপড়েটা পূর্ব্বের মত শব্দ আরো কয়েকবার করে আমায় বুঝিয়ে দিলে খাবারের প্রতিশব্দ পিঁপড়েদের ভাষায় কি।

এরপর পিঁপড়েদের ভাষা শেখা আমার খুব তাড়াতাড়িই হতে লাগল। সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত সেই বৃহৎ মস্তক পিঁপড়েটি আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে আমায় কয়েক মাসের মধ্যেই এমন তালিম করে তুললে যে, তাদের ভাষা শুধু বোঝা নয় কতকটা বলতে পর্য্যন্ত আমি পারলাম। এখন থেকে পিঁপড়েদের বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ আমার পক্ষে সম্ভব হ'ল।

যে কাণের যন্ত্রের দ্বারা পিঁপড়েদের ভাষা আমি বুঝলাম তার এবং কেন পিপড়েদের শব্দ মানুষ শুনতে পায়না সে বিষয়ের একটু ব্যাখ্যা এখানে প্রয়োজন। তোমরা জান কি না, জানি না যে, মানুষের কাণ দিয়ে আমরা যে শব্দ শুনতে পাই তা ছাড়া আরো অনেক শব্দ পৃথিবীতে হচ্ছে। শব্দে এমন ভয়ঙ্কর জোর আছে যে তা আমাদের কাণ ধরতেই পারে না। আবার অত্যন্ত ধীর শব্দও আমরা স্বাভাবিক কাণ দিয়ে ধরতে পারি না। আমরা যে শব্দ শুনি তা মাঝামাঝি আওয়াজ কিন্তু অতিকায় পিপড়েদের আর কিছু না থাক গলার আওয়াজ এমন প্রচণ্ড যে মানুষের কাণ তা ধরতেই পারে না। তাই পিঁপড়েদের আমাদের বোবা বলেই মনে হ'ত। আমাদের শব্দ করার শক্তি পিঁপড়েদের মত প্রচণ্ড নয় বলে আমাদের শব্দও পিঁপড়েদের কাণে যেত না। যে যন্ত্র পিঁপড়েরা আমার কাণে পরিয়ে দিল সেটিকে শব্দ শোধন যন্ত্র বলা যেতে পারে। তার

ভেতর দিয়ে পিঁপড়েদের চড়া শব্দ নরম হয়ে আমাদের কাণের উপযোগী হয়ে যায় বলেই আমি তাদের
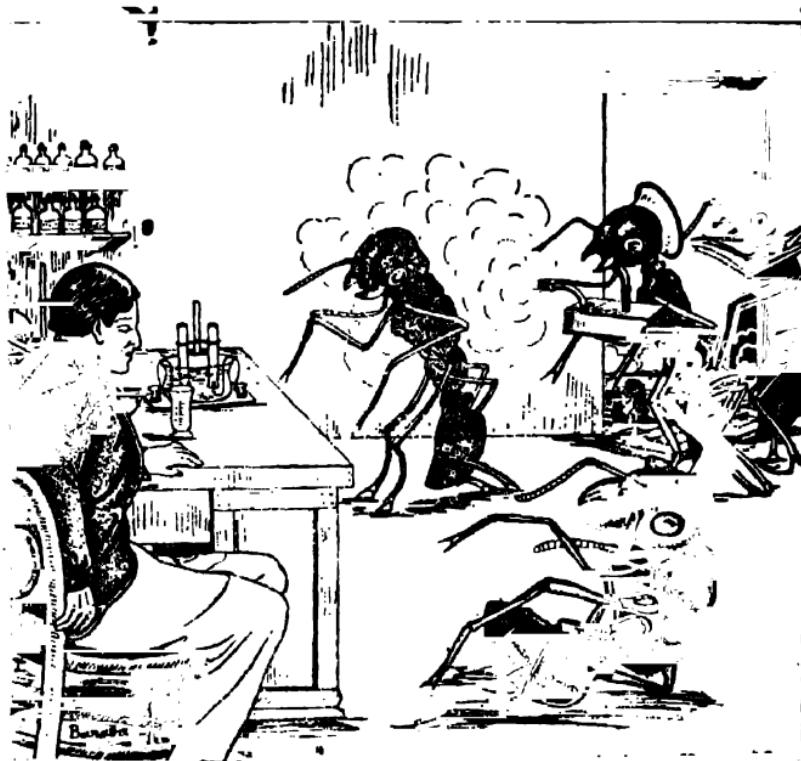
পরীক্ষাগারে পিঁপড়ের পাল্লায়। ৪৭ পৃষ্ঠা

কথা শুনতে পেরেছিলাম। আবার আমার মৃদু শব্দ তাদের কাণের মত চড়া করে নেবার জন্যে

পিঁপড়েরা নিজেদের কাণে অন্যরকম যন্ত্র ব্যবহার করেছিল। সে দিন থেকে সেই যন্ত্রের সাহায্যেই আমাদের কথা বার্ত্তা চলতে সুরু হয়। আমাদের কাণের এই রহস্য বুঝে যে বৈজ্ঞানিক পিঁপড়ে এই যন্ত্র আবিষ্কার করে—শত্রু হলেও তাকে প্রশংসা না করে থাকা যায় না।

পিঁপড়েদের সমাজ, ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার নেই। সাধারণ ছোট পিঁপড়েরা কি ভাবে বাস করে তা তোমরা বোধ হয় জান। তাদের ভেতর একজন থাকে রাণী। সেই ডিম পাড়ে ও তার ডিম থেকেই সমস্ত পিঁপড়ের জন্ম হয়। দু-একটি পুরুষ পিঁপড়ে ছাড়া আর বাকী সমস্তই পিঁপড়ের রাজ্যে শ্রমিক, তারা রাণীর জন্য খেটে মরে মাত্র। অতিকায় পিঁপড়েদের সমাজ ব্যবস্থা প্রায় এই রকমই, শুধু তাদের ভেতর কোন রাণী নেই। তাদেরও অধিকাংশ পিঁপড়ে শুধু দাসবৃত্তি করে জীবন কাটায়—তাদের না আছে ঘর, না আছে স্ত্রী পুত্র।

কিন্তু তাদের ওপরে একদল পিঁপড়ে থাকে, পালন শাসন প্রভৃতি সব কাজ তারাই করে। তারা পিঁপড়েদের রাজবংশ। তারা অনেকটা মানুষের মত স্ত্রী পুত্র নিয়ে পরিবার বেঁধে থাকে। যা কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণা, রাজ্য পরিচালনা, যুদ্ধে নেতৃত্ব তাদের দ্বারাই হয়। এবং তাদেরই ছেলে পুলেদের ভেতর যাদের বুদ্ধি অল্প ও ক্ষমতা কম তাদের ছেলেবেলা থেকে দাস করে দেওয়া হয়। দাস পিঁপড়েরা বিয়েও করে না, তাদের ছেলেপুলে সংসারও হয় না। তারা তাই বলে অসন্তুষ্টও নয়—এবং উৎপীড়িতও হয় না। পিঁপড়েদের রাজবংশের এক একটি দম্পতীর ছেলে পুলে হয় অসংখ্য। ডিম ফেটে বেরুবার পরই বৈজ্ঞানিকেরা এসে তাদের পরীক্ষা করে যায় এবং প্রাচীন স্পার্টানদের মত তাদের ভেতর একেবারে যারা অকর্ম্মণ্য তাদের মেরে ফেলে, অপেক্ষাকৃত নির্ব্বোধদের দাস করে দিয়ে বাকী শিশু পিঁপড়েদের ভেতর কার মাথা কোন

দিকে খেলবে আগে থাক্‌তে বুঝে সেই দিকে তাকে শিক্ষা দেবার জন্যে পাঠিয়ে দেয়। শিশু অবস্থাতেই প্রত্যেকের শক্তি বিচারের বিদ্যায় পিঁপড়েরা যে কতদূর অগ্রসর হয়েছে মানুষ তা ভাবতেই পারে না। পিঁপড়েদের ভেতর রাজা নেই। অনেকটা আমাদের গণতন্ত্রের মত তাদের রাজ বংশের মেয়ে পুরুষ সবাই মিলে এক সভায় বসে রাজ কার্য্য পরিচালনা করে। সেখানে বিশেষ মতভেদ গোলমাল কখন হয় না। কারণ, যার মাথা ইঞ্জিনিয়ারিংএ খোলে সে কখন রাজনীতিতে মাথা ঘামাতে আসে না।

পিঁপড়েদের ভেতর বড়লোক কেউ নেই, গরীবও না। যার যা দরকার রাজভাঁড়ার থেকে সবাই তাই পায়। একদল পিঁপড়ে শুধু এই কাজেই আছে। পিঁপড়েরা কেউ কিছু সঞ্চয় করে না সুতরাং অর্থ নিয়ে মারামারি কাটাকাটি সেখানে নেই। যে যার নিজের কাজ করতে পেলেই তারা সন্তুষ্ট।

কিন্তু জ্ঞানে বিদ্যায় সমাজ গঠনে তারা বিশেষ অগ্রসর হলেও কলা বিদ্যা তাদের নেই বল্লেই হয়। রাজবংশের পিঁপড়েদের মাঝে মাঝে কাজের অবসরে একত্র হয়ে নাচের মত এক রকম মজলিশ করতে দেখেছি, এ ছাড়া গান বাজনা, ছবি আঁকা বা চৌষট্টীকলার কোনটির তাদের চর্চ্চা নেই।

স্নেহ দয়া মমতা প্রভৃতি বৃত্তিরও তাদের একান্ত অভাব। তারা শুধু ন্যায় বিচার জানে। কিন্তু ন্যায় অন্যায়ের জ্ঞানও তাদের অদ্ভুত।

এখন কি করে সেখান থেকে পালিয়ে এলাম সংক্ষেপে বলে এ কাহিনী শেষ করব।

পিঁপড়েদের ভেতর পাঁচ বৎসর থেকে তাদের ভাষা শিখে, তাদের ভেতর প্রতিপত্তি লাভ করা সত্ত্বেও মানুষের সংসর্গের জন্যে মন আমার অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিল। শুধু পালান অসম্ভব জেনেই চুপ করে থাকতাম। একদিন কিন্তু অভাবনীয় রূপে সে সুযোগ এসে গেল। রায়ো ডি জানেইরোর

কাছে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। একদিন হঠাৎ সে ভূমিকম্প একটু ভীষণ ভাবে দেখা দিল। ভূমিকম্প হবামাত্র পিঁপড়েদের নিয়ম নীচের গর্ত্ত থেকে ওপরে মাটির ওপরে বেরিয়ে যাওয়া। আমি যেমন স্নুড়ঙ্গ দিয়ে নেমেছিলাম সে রকম স্নুড়ঙ্গ সেখানে আরো প্রায় পঞ্চাশটি আছে। ভূমিকম্প আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে সার বেঁধে পিঁপড়েদের দলের সঙ্গে আমি বেরিয়ে পড়লাম। পিঁপড়েরা ব্যস্ত হতে জানে না— শুধু এই ভূমিকম্পেই তাদের যা বিচলিত হতে দেখেছি। এক এক দল করে লিপ্টের মত খাঁচায় ঢুকে ওপরে আমরা উঠে এলাম। অন্যান্য অনেক বার দেখেছি ওপরে উঠতে না উঠতেই ভূমিকম্প থেমে যায়। কিন্তু এবারে ভূমিকম্প অত্যন্ত ভীষণ হয়ে উঠল। আমাদের দল ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই স্নুড়ঙ্গ পথটি ধ্বসে নীচে পড়ল। চারিদিকে তখন ভীষণ বিশৃঙ্খলা ; প্রতি মুহূর্ত্তে পায়ের তলার মাটি ধ্বসে পড়তে পারে জেনে পিঁপড়েরা ব্যাকুল ভাবে

যেদিকে সেদিকে ছুটতে স্থরু করেছে। আমিও প্রাণ ভয়ে একদিকে ছুট দিলাম। ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে তখন ভয়ানক ঝড়ও উঠেছে। সেই সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। খানিকদূর ছোটবার পর দেখলাম চারিধারে কোথাও কোন পিঁপড়ের দেখা নেই। এতদিন পিঁপড়েদের সঙ্গে বাস করে তাদেরই সঙ্গী ও সহায় বলে ভাববার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। প্রথমটা সত্যই অত্যন্ত ভয়ই পেলাম। ভূমিকম্পে তখন নানা জায়গায় মাটি ফেটে আগুন ও ধোঁয়া বেরুতে আরম্ভ করেছে। পিঁপড়েদের ভাষায় চীৎকার করে ডাকলাম। এই মানুষশূন্য আমেরিকায় একমাত্র পরিচিত পিঁপড়েদের আশ্রয়চ্যুত হয়ে আমি কোথায় যাব! কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই একটি কথা হঠাৎ মনে হওয়ায় আমার কণ্ঠের ডাক আপনিই থেমে গেল। এই ত মুক্তির স্থযোগ। পিঁপড়েরা হাজার ভাল ব্যবহার করলেও চিরদিন আমায় নজরবন্দী করে রাখবে, কোন দিন মানুষের

মাঝে ফিরতে দেবে না। আমি যে তাদের অনেক কথা জানি। হয় মৃত্যু নয় মুক্তির এই ত সুযোগ। পিঁপড়েদের দেখা পাওয়া নয় কোন রকমে তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে এই অবসরে পালিয়ে যাওয়াই হল আমার উদ্দেশ্য, প্রাণপণে ছুটতে লাগলাম।

ভূমিকম্প যখন থামল পিঁপড়েদের ঘাঁটি থেকে তখন আমি অনেক দূর এসে পড়েছি। এইবার আমার খোঁজ পড়বে জেনে ক্লান্ত পদেও আরো এগিয়ে চলতে লাগলাম। আমার একমাত্র মুক্তির উপায় সমুদ্র তীরে পেঁাছে কোন রকমে ভেলা তৈয়ারী করে সমুদ্রে ভাসা। সে সমুদ্রে যদি মৃত্যুও হয় তবু ভালো, তবু আকাশের তলায় ফাঁকা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে মরতে পারব। ইঁদুরের মত মাটির নীচে মরতে হবে না।

কেমন করে সমুদ্রতীরে পেঁাছে ভেলা তৈয়ারী করে ভেসে পড়েছিলাম ও কেমন করে আমার উদ্ধার

হয় তার কথা সব সংবাদপত্রেই বেরিয়েছে সুতরাং তার পুনরাবৃত্তি করে কাহিনী বাড়াব না।

পরিশেষে বলতে চাই যে মানুষ আবার দক্ষিণ আমেরিকা অধিকার করবার আয়োজন করছে—কিন্তু আমার সে আয়োজনের প্রতি আস্থা নেই। দক্ষিণ আমেরিকা অধিকার দূরের কথা মানুষের বর্ত্তমান অধিকারগুলি এই দুর্দ্ধর্ষ কীটেদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করাই একদিন আমাদের সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে বলে আমার বিশ্বাস। পিঁপড়েদের আমি যে রকম করে জানবার সুযোগ পেয়েছি তাতে এ রকম বিশ্বাস আমার সহজেই জন্মেছে।